সূচিপত্র

সূচনাকথা	১১
কাঁচের ফুলদানি	১২
ছেড়ে যাওয়া মানুষগুলো কি ফিরে আসে?	২০
শূন্যতার মাঝে	২৬
শূন্য কলস	৩১
আমরা কীসে আসক্ত হতে পারি?	৩৩
উপহারের প্রেমে মজে	৩৬
চাতালপুর	৪১
এই সাগরের নাম পৃথিবী	৪৫
হৃদয়ের প্রত্যাবর্তন	৫০
জঘন্য জেলখানা	৫৪
এরই নাম ভালোবাসা?	৫৯
ভালোবাসা আজি বাতাসে	৬৩
এই তো ভালোবাসা	৬৬
প্রকৃত ভালোবাসার সন্ধানে	৬৯
দাম্পত্য জীবনে সুখের চাবি	৭৫

ঝড়ের রাতের একমাত্র আশ্রয় ৮০
আমার জান্নাতের বাড়ি ৮৪
কষ্টের মুখে ৮৮
জীবনের স্বপ্ন ৯৩
বন্ধ দুয়ার : সমুখে অন্ধ আমি ৯৮
কষ্টশুদ্ধি ১০৩
প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ১০৭
জীবন : জেলখানা না জান্নাত? ১১৩
সালাত : জীবনের বিস্মৃত উদ্দেশ্য ১১৭
সালাতচোর ১২১
নিবিড় আলাপন ১২৪
আঁধার রাতের আলো ১২৬
আমার দুআ কেন কবুল হয় না? ১৩০
ফেইসবুক : ছদ্মবেশী আপদ ১৩২
এরই নাম জাগরণ ১৩৬
নারীর ক্ষমতায়ন ১৪৩
নারী-ইমামতি নিয়ে এক নারীর ভাবনা ১৪৭
পুরুষত্ব বনাম কঠোরতার মুখোশ ১৫১
তকমাটা ঝেড়ে ফেলুন ১৫৫
মুসলিম, তবে... ১৫৮
বেদনার ভারে ন্যুব্জ উম্মাহ ১৬১
শেষ কথা ১৬৫

কাঁচের ফুলদানি

তখন বয়স মোটে সতেরো। একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম। দেখেছিলাম আমি একটি মসজিদের ভেতর বসে আছি। ছোট্ট এক মেয়ে কোত্থেকে যেন দৌড়ে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা বলো তো, মানুষগুলো কেন একজন আরেকজনকে ছেড়ে চলে যায়?'

প্রশ্নটা শুনে ভাবলাম, আরেহ, এটা তো আমারই প্রশ্ন; আর আমাকেই কিনা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে! পরে অবশ্য বুঝতে পেরেছিলাম, প্রশ্নটা কেন আমাকেই করা হয়েছিল।

মানুষের সাথে খুব বেশি মিশে যেতাম আমি। সম্পর্কগুলোর মায়ায় জড়িয়ে যেতাম। ছোটবেলা থেকেই আমার মন-মেজাজ ছিল অন্যরকম। অন্যান্য ছেলেমেয়েদের স্কুলে দিয়ে তাদের বাবা-মা'রা যখন চলে যেত, ছেলেমেয়েগুলো সহজেই সেটা সামলে উঠতে পারত। আমি কেন যেন পারতাম না। চোখে পানির ফোয়ারা একবার শুরু হলে সেটা আর বাধ মানতে চাইত না। বড় হতে হতে চারপাশের সবকিছুর মায়ায় নিজেকে জড়িয়ে নিতে লাগলাম। ক্লাস ওয়ান থেকেই আমার মনে হচ্ছিল, আমার একজন বান্ধবী দরকার। আরেকটু বড় হলাম। বান্ধবীদের সাথে এটা-ওটা নিয়ে মাঝে-মধ্যে ঝগড়া হতো, খুব খারাপ লাগত আমার। সবকিছুর মায়াতেই জড়িয়ে যেতাম : মানুষ, নতুন জায়গা, স্মরণীয় ঘটনা, ছবি, মুহূর্ত—এমনকি কোনো কাজের ফলাফলের সাথেও জড়িয়ে পড়তাম। আমি যেভাবে চাইতাম, যেভাবে কল্পনা করতাম, সেভাবে কিছু না হলেই কেমন যেন লাগত। হতাশায় ভেঙে পড়তাম। একবার পড়ে গেলে আর উঠে দাঁড়াতে পারতাম না। ভুলতে পারতাম না,

ক্ষত আর শুকাত না। যেন একটা কাঁচের ফুলদানি। টেবিলের এক কোণায় রাখা। একবার ভেঙেছে তো আর জোড়া লাগার কোনো উপায় নেই।

কাঁচের ফুলদানি, সে তো ভাঙবেই। একবার কেন, বারবারই ভাঙবে; কিন্তু সমস্যা তো ফুলদানির নয়। এতবার ভাঙার পরও আমি যে বারবার ফুলদানিটা টেবিলের কোণায় রাখতাম, আসল সমস্যা তো এটাই। আমার চাওয়া-পাওয়া পূরণের জন্য অন্য মানুষগুলোর ওপর, তাদের সাথে আমার সম্পর্কের ওপর খুব বেশি নির্ভর করতাম। সম্পর্কগুলোকে সুখ-দুঃখ নিয়ন্ত্রণের অধিকার আমিই দিয়েছিলাম। দিয়েছিলাম আমার চাহিদা আর শূন্যতা পূরণের অধিকার। আত্মমর্যাদা আর নিরাপত্তা দানের অধিকার। টেবিলের কোণায় ফুলদানি রেখে যেভাবে নিজ হাতে ওটা ভাঙার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম, ঠিক সেভাবেই এসব সম্পর্কের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভর করে নিজ হাতে হতাশার বীজ বুনেছিলাম। ভাঙার জন্য আমি নিজেই আমাকে ঠেলে দিয়েছি। আর এসবের কী সুন্দর প্রতিদানই-না আমি পেয়েছি : একটা হতাশার পর আরেকটা হতাশা, একবার ভেঙে পড়ার পর আবার ভেঙে পড়া।

সম্পর্কগুলো ভেঙে যাওয়ার জন্য আমি মোটেও সেই মানুষগুলোকে বা সেই সম্পর্কগুলোকে দায়ী করব না। কোণায় রাখলে ফুলদানি তো ভাঙবেই, এখানে ফুলদানির কী দোষ! গাছের ছোট ডালের ওপর ভর করলেই হলো? ওটা কি আর আমার মতো কাউকে ধরে রাখতে পারে? যদি সত্যিকার অর্থেই কেউ আমাদের আশ্রয় দিতে পারেন, তবে তিনি আল্লাহ ছাড়া আর কে! তিনি বলেছেন, 'বিভ্রান্তকারী মিথ্যা উপাস্যকে যে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আল্লাহকে সত্যিকার অর্থেই বিশ্বাস করেছে, সে এমন এক সুদৃঢ় হাতল ধরেছে, যেটা কখনো ভাঙবার নয়। আর আল্লাহ সব শোনেন, সব জানেন।'[১]

খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা আছে এই আয়াতে—

কেবল একটি হাতলই আছে যা কক্ষনো ভাঙে না। কেবল একটি জায়গায়ই আছে, যেখানে আমরা আমাদের সব নির্ভরতা ছেড়ে দিতে পারি। কেবল একটি সম্পর্কই আছে, যা বলে দিতে পারে আমাদের প্রকৃত সম্মান কীসে। কেবল সেই সম্পর্ক থেকেই আমরা জীবনের চূড়ান্ত সুখ, পূর্ণতা ও নিরাপত্তা পেতে পারি। কোন সেই

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ২৫৬

সম্পর্ক? সেই সম্পর্ক হচ্ছে মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্ক।

আর আমরা কিনা সেগুলো খুঁজে ফিরি এই দুনিয়াতে।

কেউ খোঁজে তার ক্যারিয়ারের মাঝে, কেউ খোঁজে সম্পদে, কেউ-বা আবার সামাজিক মর্যাদায়। আবার আমার মতো কেউ হয়তো খোঁজে বিভিন্ন সম্পর্কের মাঝে। এলিজাবেথ গিলবার্ট তার *Eat, Pray, Love* বইতে নিজের সুখ অন্বেষণের গল্প শুনিয়েছিলেন। এক সম্পর্ক ছেড়ে আরেক সম্পর্ক গড়ে, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে ঘুরে তিনি জীবনের পূর্ণতা খুঁজতেন। বিভিন্ন সম্পর্কের মধ্যে, ধ্যানের মধ্যে, এমনকি খাওয়া-দাওয়ার মধ্যেও তিনি তার চাওয়া-পাওয়াগুলো খুঁজে ফিরেছেন; কিন্তু দিন শেষে সব জায়গা থেকেই ফিরেছেন ব্যর্থ হয়ে।

আমিও ঠিক একই কাজ করেছি। নিজের শূন্যতা পূরণের চেষ্টা করেছি এমন করেই। ছোট্ট সেই মেয়েটি যে তাই এই প্রশ্নটাই করবে—এটাই তো স্বাভাবিক। এই প্রশ্ন ছিল না পাওয়ার বেদনা থেকে, হতাশা থেকে। এই প্রশ্ন নিজের ভেঙে পড়ার প্রশ্ন, কোনো কিছু খুঁজে খুঁজে শেষমেশ খালি হাতে ফেরার প্রশ্ন। এ যেন হাত দিয়ে ইটের দালান ভাঙতে যাওয়ার মতো; ব্যর্থ হয়ে তো ফিরবেনই, হাত দুটোও হবে রক্তাক্ত। আর এই চরম সত্যগুলো আমি কোনো বই থেকে শিখিনি, শিখিনি কারও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা থেকে। আমি শিখেছি আমার হতাশা থেকে, আমার বেদনা থেকে।

ছোট্ট সেই মেয়েটির প্রশ্ন আসলে আমারই প্রশ্ন... আমিই আমাকে প্রশ্ন করেছি।

প্রশ্নটা আসলে এই দুনিয়ার বাস্তবতা নিয়ে। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী কিছু মুহূর্ত আর ক্ষণিকের কিছু সম্পর্ক নিয়ে। দুনিয়াতে আমাদের আশেপাশের মানুষগুলো আজ আছে তো কাল নেই। হয় তারা দূরে কোথাও চলে যায়, নতুবা মারা যায়। কিন্তু বাস্তবতা আমাদের কষ্ট দেয়। কারণ, চিরস্থায়ী কোনো কিছু আঁকড়ে ধরাই আমাদের স্বভাব। যা কিছু নিখুঁত ও দীর্ঘস্থায়ী সেগুলো চাওয়া, সেগুলোকে ভালোবাসা কিংবা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করাই আমাদের বৈশিষ্ট্য।

আমরা চিরস্থায়ী কিছু খুঁজে ফিরি; কারণ, দুনিয়ার জীবনের জন্য তো আমাদের সৃষ্টি করা হয়নি; আমাদের প্রথম ও প্রকৃত বাড়ি তো জান্নাতে। ওটা যেমন নিখুঁত তেমনি চিরস্থায়ী। কাজেই এমন জীবনের স্বাদ খোঁজা আসলে মানবপ্রকৃতিরই একটি অংশ। সমস্যা হচ্ছে আমরা সেটা এই দুনিয়াতে খুঁজি। আর তাই বুঝি আমরা বয়সকে ধরে

রাখতে, চামড়ায় বলিরেখা ঠেকাতে ক্রিম কিনি। কসমেটিক সার্জারি করি। আমরা দুনিয়াকে জান্নাত বানাতে চাই; সেটা কি হয় কখনো? মনকে যখনই দুনিয়ার মায়ায় বেশি জড়িয়ে ফেলি, তখনই সেটা ভেঙে যায়। দুনিয়া আমাদের কষ্ট দেয়। কারণ, দুনিয়া মানেই হলো যেটা ক্ষণস্থায়ী, ত্রুটিপূর্ণ। আমাদের মনের মাঝে যে আকাঙ্ক্ষা আল্লাহ পুরে দিয়েছেন সেটা কেবল কোনো চিরস্থায়ী নিখুঁত জিনিস দিয়েই পরিপূর্ণ হতে পারে। ক্ষণিকের কোনো কিছু দিয়ে সেটা পূরণ করতে যাওয়ার মানে হলো মরীচিকার পানি দিয়ে তেষ্টা মেটানো। খালি হাতে দালান ভাঙা। প্রকৃতিগতভাবে যেটা ক্ষণস্থায়ী সেটাকে চিরস্থায়ী রূপ দেওয়ার চেষ্টা অনেকটা আগুন থেকে পানি বের করার মতো। আগুনের ধর্মই জ্বালিয়ে দেওয়া। ওটা থেকে কি আর তৃষ্ণা মেটানো যায়! যখনই আমরা দুনিয়ার আশা ছেড়ে দেবো, কেবল তখনই এই পার্থিব জীবনে মনভাঙার মতো কঠিন যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হতে পারব। দুনিয়া জান্নাত নয়, সেটা কখনো হবেও না।

আমাদের বুঝতে হবে, কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া কিছু হয় না। কিছুই না। মনভাঙার পেছনে কারণ আছে। কষ্ট পাওয়ার পেছনেও কারণ আছে। এই ভাঙা হৃদয় আর কষ্টের মধ্যেই আমাদের জন্য আছে শিক্ষা ও আল্লাহর প্রজ্ঞার নিদর্শন। কিছু একটা যে ভুল হচ্ছে, আমাদের যে বদলাতে হবে—এগুলো তারই সতর্কবার্তা। আগুনে হাত পুড়ে যেতে থাকলে আমরা তো এই সতর্কবার্তাই পাই যে, আমাদের হাত সরাতে হবে। তেমনি মানসিক দুঃখকষ্টগুলোও আমাদের এই কথাই বলে যে, আমাদের ভেতরটাকে বদলাতে হবে। কিছু একটা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে। যন্ত্রণা আমাদের বাধ্য করে বিচ্ছিন্ন হতে। ভালোবাসার কোনো মানুষ যখন বারবার আমাদের কষ্ট দেয় তখন যেমন আমরা তার থেকে দূরে সরে যাই, ঠিক তেমনি এই দুনিয়া যত বেশি আমাদের কষ্ট দেয় তত বেশি আমরা অনিবার্যভাবে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি।

কোনো কিছু থেকে কষ্ট পেলে বোঝা যায় কীসের মায়ায় আমরা বেশি জড়িয়ে আছি। যে জিনিসটা আমাদের কাঁদায়, বেশি কষ্ট দেয়, বুঝতে হবে, সে জিনিসের সাথেই আমাদের মায়া জড়িয়ে আছে। অথচ আমাদের দরকার আল্লাহর মায়ায় জড়ানো। আর যে জিনিসগুলো আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়তে বাধা দেয় সেগুলো থেকে দূরে থাকা। এসব যন্ত্রণাই আমাদের জীবনের মিথ্যে মায়াকে স্পষ্ট করে তোলে। দুঃখ-কষ্ট আমাদের জীবনে এক জটিল পরিস্থিতি তৈরি করে। আমরা এই জটিল অসহনীয় পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথ খুঁজি। নিজেদের বদলানোর

ব্যাপারে আমাদের যদি যথেষ্ট মানসিক শক্তি না থাকে, তাহলে কুরআনের এই কথাই যথেষ্ট—আল্লাহ কখনো কারও অবস্থা বদলাবেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।[১]

বছরের পর বছর ধরে মানুষের কাছ থেকে কষ্ট পেতে পেতে একসময় ধরতে পারলাম আমার মূল সমস্যা কোথায়। সবসময় ভেবে এসেছি, দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা মানে হলো দুনিয়াবি জিনিসের মায়ায় জড়িয়ে থাকা। আমি ভাবতাম, দুনিয়ার প্রতি আমার কোনো আসক্তি নেই। আমি তো শুধু কিছু মানুষের মায়ায় পড়ে আছি। কিন্তু আমি আসলে বুঝিনি যে, এই মানুষগুলো, কিছু মুহূর্ত আর আবেগ—এগুলো সবই দুনিয়ার অংশ। আমি একেবারেই বুঝতে পারিনি যে, আমি যে অসহনীয় যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি এগুলোর পেছনে কারণ একটাই, শুধু একটাই—দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা।

যখন বুঝতে পারলাম, তখন মনে হলো আমার চোখের সামনে থেকে যেন একটা পর্দা সরে গেল। মূল সমস্যা কোথায় সেটা নিজের চোখে দেখতে পারলাম—আমি চাচ্ছিলাম দুনিয়ার জীবনকে কষ্টহীন নিখুঁত করতে; কিন্তু তা তো কখনো হওয়ার নয়; কিন্তু ওই যে একবার ওভাবে জীবনটাকে ভেবে নিয়েছিলাম! তাই তো জীবনটাকে কষ্টহীন করতে, নিখুঁত করতে, আমার যত রক্ত, ঘাম আর অশ্রু বিসর্জন! জান-প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করেছিলাম দুনিয়াকে জান্নাত বানাব বলে।

সম্পর্কগুলোর প্রতি আমার প্রত্যাশা ছিল অনেক। আশেপাশের মানুষগুলো একদম ভালো হবে। সম্পর্কগুলো খুব সুন্দর হবে। আমার জীবন ও আমার চারপাশে কত কিছুই না আশা করেছিলাম। কত আশা, কত সাধ, কত স্বপ্ন। জীবনে অসুখী হওয়ার পেছনে কেবল একটি রেসিপি যদি থাকে তাহলে সেটা হলো—আশা। আমার জীবনের চরম ভুল ওটাই। হ্যাঁ, আশা করাটা ভুল না; কারণ, মানুষ হিসেবে আমাদের কখনোই নিরাশ হওয়া উচিত না। তবে ভুলটা ছিল আমি 'কোথায়' আশা-ভরসা করেছিলাম দিন শেষে; আমার আশা-ভরসা আল্লাহর ওপর ছিল না। আমার আশা-ভরসা ছিল মানুষের ওপর, মানুষের সম্পর্কের ওপর। আমার ভরসা ছিল দুনিয়ার ওপর, আল্লাহর ওপর না। এভাবেই একসময় আমি কঠিন একটা সত্য বুঝতে পারলাম। কুরআনের একটি আয়াত বারবার আমার মাথায় ঘুরতে

[১] সূরা রাদ, আয়াত : ১১

লাগল। আয়াতটি আগেও অনেকবার শুনেছি, তবে প্রথম বারের মতো আমি বুঝতে পারলাম এ আয়াতটি যেন আমাকে নিয়েই—নিশ্চয় যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে না; বরং দুনিয়ার জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট; আর নিশ্চিন্ত মনে আছে, আমার নিদর্শনমালা থেকে বেখবর হয়ে আছে, তাদের কৃতকর্মের জন্যই তাদের স্থান হবে জাহান্নামে।[১]

দুনিয়াতেই সব পাব—এমন চিন্তাভাবনার মাধ্যমে আমি আসলে আল্লাহর ওপর ভরসা করিনি। আমার ভরসা ছিল এই দুনিয়ার ওপর। দুনিয়াতে আপনার যত বন্ধুই থাকুক না কেন, কখনো ভাববেন না যে, বন্ধুরা আপনার শূন্যতা দূর করবে। যখন বিয়ে করবেন, তখন আশা করবেন না যে, আপনার সব প্রয়োজন আপনার সঙ্গী মেটাবে। যখন কোনো কাজ করবেন, সবসময় যে প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রাপ্তি মিলবে এমনটি ভাববেন না। কোনো সমস্যায় পড়লে ভাববেন না, আমি একাই এর সমাধান করে ফেলতে পারব।

অন্যের ওপরও নির্ভর করবেন না। ভরসা করবেন কেবল আল্লাহর ওপর।

মানুষের সাহায্য নিন—তবে মনে রাখবেন, কোনো লোক কিংবা আপনি নিজেও আপনাকে রক্ষা করতে পারবেন না। কেবল আল্লাহই আপনাকে রক্ষা করতে পারবেন। আল্লাহই এই মানুষগুলোকে আপনার সাহায্যের জন্য পাঠান; কিন্তু এরা আপনার সাহায্যের উৎস নয়, আপনার পরিত্রাণের উৎস নয়। একমাত্র আল্লাহই আপনাকে সাহায্য করেন, আপনাকে রক্ষা করেন। মানুষ তো এমনকি একটা মাছির পাখাও সৃষ্টি করতে পারে না। আপনার কী উপকার করবে! পরস্পরের সঙ্গে যখন কথা বলবেন, তখনো আল্লাহর দিকে নিজের মনকে ফিরিয়ে রাখুন। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম কত সুন্দর করেই না বলেছেন, মহাবিশ্ব ও পৃথিবী সৃষ্টিকারী সেই মহান আল্লাহর দিকেই আমি একনিষ্ঠভাবে আমার মুখ ফেরালাম। আমি কক্ষনো তাঁর সাথে কোনো শরিক করব না।[২]

আমাদেরও এভাবেই পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর ওপর ভরসা করতে হবে, নির্ভর করতে হবে, আস্থা রাখতে হবে। যেদিন সেটা করতে পারব, সেদিন বুঝতে পারব—

---

[১] সূরা ইউনুস, আয়াত : ৭-৮

[২] সূরা আনআম, আয়াত : ৭৯

অন্তরের প্রশান্তি আর স্থিরতা কাকে বলে। যে উঁচুনিচু গিরিপথ আমাদের জীবনকে তাল-বেতাল করে দিচ্ছিল—সেই পথে আমাদের আর চলতে হবে না। কেননা, আমাদের হৃদয় যদি এমন কিছুর ওপর নির্ভর করে, এমন এক সত্তার ওপর নির্ভর করে—যিনি অবিচল; তাহলে আমাদের হৃদয়ও হবে অবিচল। আর আমরা যদি এমন কিছুর ওপর নির্ভর করি, যা নিজেই সবসময় বদলে যাচ্ছে, যা ক্ষণস্থায়ী, তবে আমরাও হব অস্থির, উত্তেজিত। এই হয়তো আমরা কোনো কিছু নিয়ে খুশি হলাম, কিন্তু যেই-না আমাদের খুশির কারণ বদলে গেল, অমনি আমাদের খুশি ছুটে গেল। আমরা আবার মনমরা হয়ে পড়লাম। একবার এদিকে দুলি কি আরেকবার ওদিকে। বুঝতেও পারি না, কেন এমন হচ্ছে।

যতদিন না আমরা চিরস্থায়ী ও অবিচল কোনো সত্তার সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করছি ততদিন আমরা স্থির হতে পারব না। এমন তাল-বেতাল হতেই থাকবে। আমরা কীভাবে আশা করি যে, যা একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে, যা নিজেই অস্থির তার ওপর ভরসা করলে আমাদের মন শান্ত হবে? সাহাবি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর একটি কথায় এ ব্যাপারটা আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করা যায়।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মারা যান, লোকজন তখন এতটাই শোকাহত যে, কোনোভাবেই খবরটা মেনে নিতে পারছিল না। তাকে সবচে বেশি ভালোবাসতেন যারা—তাদের একজন হলেন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু । যার ভালোবাসা বেশি, তার কষ্টটাও বেশি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি এত ভালোবাসা থাকার পরও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, প্রকৃত অর্থে কার ওপর আমাদের ভরসা করা উচিত। তিনি বললেন, 'আপনারা যদি মুহাম্মাদের উপাসনা করে থাকেন, তাহলে মন দিয়ে শুনুন, তিনি মারা গেছেন। আর আপনারা যদি সত্যিই আল্লাহর ইবাদত করে থাকেন, তাহলে জেনে রাখুন, আল্লাহ কক্ষনো মারা যান না।'[১]

মানসিক প্রশান্তির এমন স্তরে পৌঁছাতে হলে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সম্পর্ককে কোনো অভাব পূরণের উৎস হতে দেওয়া যাবে না। জীবনের সাফল্য, ব্যর্থতা কিংবা আত্ম-মর্যাদা আল্লাহ ছাড়া আর কারও সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করা যাবে না। যদি এটা করতে পারেন, তাহলে আপনি আর কখনোই ভেঙে পড়বেন না। আপনাকে আর

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ১২৪২

কেউ হারাতে পারবে না। কীভাবে হারাবে, আপনি যাঁর ওপর নির্ভর করেছেন তাকে কি কেউ হারাতে পারে? আপনি কক্ষনো শূন্যতা অনুভব করবেন না। কীভাবে করবেন, আপনার পরিতৃপ্তির উৎস যে কখনোই ফুরোবে না, কমবে না।

আজ আমি যখন আমার সেই ১৭ বছরে দেখা স্বপ্নটার কথা মনে করি, তখন ভাবি সেই ছোট্ট মেয়েটি কি আমিই ছিলাম! মানুষ কেন ছেড়ে চলে যায়—এ প্রশ্নের উত্তরে আমি তাকে বলেছিলাম, 'কারণ, দুনিয়ার জীবন তো জান্নাত নয়। যদি হতো, তাহলে পরকালের জীবনকে কী বলা হতো।'

জীবনের পরবর্তী যন্ত্রণাকাতর বছরগুলোতে ঠেকে ঠেকে যেই নিদারুণ অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল, সেই সময়টায় এই উত্তরটা আমার জন্য ছিল মহৌষধস্বরূপ।

এই সাগরের নাম পৃথিবী

গতকাল এক সৈকতে গিয়েছিলাম। ক্যালিফোর্নিয়া সাগরের ঢেউগুলো যখন তীরে আছড়ে পড়ছিল, অদ্ভুত এক ভাবনা খেলে গেল মনে। কী মনকাড়া সৌন্দর্যের আধার এই সাগর; কিন্তু কী ভীষণ ভয়ংকর। উত্তুঙ্গ যে ঢেউ আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে সেই ঢেউয়ের মাঝে হারিয়ে গেলেই সাক্ষাৎ মৃত্যু। যে পানির অপর নাম জীবন অথচ পলকেই ডুবে গিয়ে তা হতে পারে মরণের কারণ। যে সাগর ভাসিয়ে রাখে জাহাজকে, সেই সাগরই চুরমার করে তাকে।

আমাদের পার্থিব জীবন—এই পৃথিবী—সাগরের মতোই। আমাদের হৃদয় সেই সাগরে ভেসে বেড়ানো জাহাজ। আমরা এই সাগরকে ব্যবহার করতে পারি আমাদের যাপিত জীবনের প্রয়োজন-পূরণে। আমাদের শেষ ঠিকানায় পৌঁছাতে। সেখানে পৃথিবী নামক সাগর শুধু এক মাধ্যম মাত্র। আমরা এ সাগর পাড়ি দিতে এসেছি; এখানে পড়ে থাকতে নয়। সাগর যদি পার হওয়ার মাধ্যম না হয়ে শেষ ঠিকানা হয়ে ওঠে, তাহলে কী হবে বলুন তো?

আমরা ডুবে মরব একসময়।

সাগরের বিপুল জলরাশি যতক্ষণ জাহাজের বাইরে থাকবে, জাহাজ সাগরে ভেসে বেড়াবে। নাবিকের নিয়ন্ত্রণে থাকবে; কিন্তু যেই-না ছিদ্র গলে পানি ঢুকবে, কী হবে তখন? কী হবে যখন পৃথিবী নামক সাগরের জল হৃদয়ের ছিদ্র দিয়ে ঢুকে পড়বে? কী হবে যখন পৃথিবী আর কোনো মাধ্যম থাকবে না?

মানব-জাহাজটা ডুবে যাবে তখন।

হৃদয় তখন জিম্মি হয়ে পড়বে। সে তখন ক্রীতদাস। যে পৃথিবীর লাগাম একদিন আমাদের হাতে ছিল, সেই পৃথিবী তখন আমাদের ওপর ছড়ি ঘুরাবে। পানি একবার জাহাজে ঢুকে গেলে সেটা তখন লাগামহীন। নাটাই তখন জলরাশির হাতে।

ভেসে থাকতে হলে পৃথিবী নামক সাগরকে মাধ্যম হিসেবে দেখা ছাড়া উপায় নেই। আল্লাহ সুবহানা ওয়া তাআলা বলেছেন, মহাকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং রাত-দিনের আবর্তনের মাঝে সমঝদারদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন আছে।[১]

আমরা পৃথিবীতে থাকি। দুনিয়াবিমুখতা (যুহদ) মানে পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা নয়; বরং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের যুহদের বাস্তব উদাহরণ শিখিয়ে গেছেন—আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, নবিজি কীভাবে ইবাদত করেন তা জানতে ৩ জন লোক এসেছিল তার স্ত্রীদের কাছে। তাদের জানানোর পর তাদের মনে এই ভাবনার উদয় হলো যে, তারা যা করে—তা তো নিতান্তই অল্প। একজন বলল, 'যে নবির অতীত-ভবিষ্যতের সবকিছু মার্জনা করে দেওয়া হয়েছে তার তুলনায় আমরা তো নস্যি।'

একজন তাই বলল, 'আমি সারা রাত সালাত আদায় করব।'

আরেকজন বলল, 'আমি লাগাতার সিয়াম পালন করব।'

অন্যজন বলল, 'আমি নারীদের থেকে দূরে থাকব। কখনো বিয়ে করব না।'

আল্লাহর রাসুল এসে তাদের কথা জানতে পেরে বললেন, 'তোমরাই কি সেই লোক যারা অমুক-অমুক কথা বলেছ? আল্লাহর কসম, তোমাদের মধ্যে আল্লাহকে আমি সবচে বেশি ভয় করি, অথচ আমি সিয়াম পালন করি আবার ত্যাগ করি। আমি ঘুমাই আবার সালাত আদায় করি। আবার নারীদের বিয়ে করি। যে আমার সুন্নাহ অনুসরণ করে না, সে আমার সঙ্গে নেই।'[২]

দুনিয়াবিমুখ হওয়ার জন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিন্তু দুনিয়া ছেড়ে

---

[১] সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৯০

[২] *সহিহ বুখারি* : ৪৭৭৬; *সহিহ মুসলিম* : ২৪৯৫

দেননি। তার দুনিয়াবিমুখতা ছিল অনেক গভীর। তার দুনিয়াবিমুখতা ছিল অন্তরের। তার চূড়ান্ত অনুরাগ ছিল কেবল আল্লাহর সঙ্গে।

দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ছাড়া কিছুই নয়। পরকালের জীবন হচ্ছে প্রকৃত জীবন; যদি তারা জানত।[১]

কুরআনের এ কথাটা মর্মে মর্মে বুঝে নিয়েছিলেন তিনি।

দুনিয়াবিমুখতার মানে এটাও নয় যে, কোনো কিছুর মালিক হতে পারব না পৃথিবীতে। অনেক সাহাবিই ধনী ছিলেন। বিমুখতা মানে পৃথিবীকে এর আসল রূপে চেনা। দুনিয়া আসলে যা তাকে সেভাবেই দেখা। এটা শুধু অবলম্বন। দুনিয়াবিমুখতা মানে পৃথিবীর স্থান হৃদয়ে নয়; হাতে।

আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'বিমুখতা মানে তুমি কিছুর মালিক হবে না তা নয়। এর মানে কোনো কিছু যেন তোমার মনিব না হয়।'[২]

ঠিক যেন সাগরের পানি জাহাজে ঢোকার মতো। যে মুহূর্তে দুনিয়ার জল অন্তরে ঢুকবে সাথে সাথে আমরা ডুবে যাব। সাগরের জল, জাহাজে ঢোকার জন্য নয়; জাহাজ পার করার জন্য। দুনিয়া তেমনি আমাদের মন দখল করার জন্য না; জান্নাতে ফিরে যাওয়ার অবলম্বন। এ কারণে কুরআনে আল্লাহ ফিরে ফিরে পৃথিবীকে বলেছেন—(متاع) 'মাতা'। অর্থাৎ, দুনিয়াটা হলো 'ক্ষণিক পার্থিব আনন্দের রসদ'। এটা উপকরণ, পথ; শেষ ঠিকানা নয়।

ঠিক এ কথাটাই বাঙময় হয়েছে নবিজির কণ্ঠে, এ দুনিয়ার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? দুনিয়াতে আমি ক্ষণিক সময় ধরে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেওয়া এক মুসাফির। কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে এ গাছকে পেছনে ফেলে আবার যাত্রা শুরু করব।[৩]

একজন সফরকারীর উপমাটা খেয়াল করুন। কোথাও সফর করার সময় কী মনোভাব নিয়ে বের হন? মাত্র এক রাত অমুক শহরে থাকবেন জানলে কতটা স্বাচ্ছন্দ্যে

---

[১] সূরা আনকাবূত, আয়াত : ৬৪

[২] *মিযানুল হিকমাহ*, খন্ড : ৪; পৃষ্ঠা : ২৯৯০; *আদ দুররাতুল বাহিরাহ*, পৃষ্ঠা : ২৯

[৩] *মুসনাদে আহমাদ* : ৩৭০৯; *জামি তিরমিযি* : ২৩৭৭

থাকবেন সেখানে? যদি জানেন—এই অবস্থান ক্ষণিকের, তবুও কি সেখানে বাকি জীবন কাটানোর বন্দোবস্ত করবেন?

সন্দেহাতীতভাবে বলা যেতে পারে, না।

ধরুন, আপনার বস আপনাকে কোনো প্রজেক্টের কাজে নতুন এক শহরে পাঠিয়েছেন। ধরুন, তিনি আপনাকে বলেননি, ঠিক কবে তা শেষ হবে। তবে আপনি জানেন, ডাক পড়লে যে-কোনো সময় ফিরতে হবে সদর দপ্তরে। তখন সে শহরে আপনার অবস্থান কেমন হবে? আপনি কি দামি ফ্ল্যাটের পেছনে টাকা ঢালবেন? সব জমানো টাকা দামি দামি আসবাবপত্র আর গাড়ির পেছনে ঢালবেন?

খুব সম্ভবত না।

দৈনন্দিন কেনাকাটার সময়ও কি দেদারসে খাবার কিনবেন?

না।

দু-চারদিন যাবে—এর চেয়ে বেশি খাবার-দাবার কিনতে ইতস্তত করবেন। কারণ, বস ডেকে ফেরত পাঠাতে পারে যে-কোনো সময়। একজন সফরকারীর মনোভাব এমনই।

কোনো কিছু ক্ষণিকের—এই উপলব্ধি যখন হৃদয়ে পোক্ত হয়, তখন স্বাভাবিক একটা ঔদাসীন্য চলে আসে সে ব্যাপারে। আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বিচক্ষণতাগুণে ওপরের হাদিসে সে কথাগুলোই বলেছেন। পার্থিব জীবনে ডুবে যাওয়ার বিপদ খুব ভালোভাবে আঁচ করেছেন তিনি। সত্যি বলতে, আমাদের জন্য তিনি একেই সবচে বেশি ভয় করেছেন—আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের জন্য দারিদ্র্যকে ভয় করি না, বলেছেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, বরং আমি ভয় করি, দুনিয়াকে তোমাদের আগেকার লোকদের জন্য যেভাবে প্রাচুর্যময় করা হয়েছিল, তোমাদের জন্যও সে রকম করা হবে। তাদের মতো তোমরাও তখন এ নিয়ে পাল্লা দেবো। তারা যেভাবে বিনাশ হয়েছিল, তোমরাও সেভাবে বিনাশ হয়ে যাবে।[১]

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ৪০১৫; *সহিহ মুসলিম* : ২৯৬১

এ পৃথিবীর করুণ বাস্তবতা তার চেয়ে ভালো আর কেউ উপলব্ধি করেননি। দুনিয়ার কোনো অংশ না হয়ে কীভাবে এখানে থাকা যায় তার বাস্তব নজির তিনি। যে মহাসাগর আমাদের পাড়ি দিতে হবে, সেই একই মহাসাগর তিনি পাড়ি দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। পার্থক্য শুধু তার জাহাজ জানত—কোথা থেকে নোঙর তুলেছে, আর কোথায় তাকে তরী ভেড়াতে হবে। তার জাহাজে পানি ঢোকার সুযোগ পায়নি। তিনি জানতেন, যে সাগরের জল আজ সূর্যের আলোয় চকমক করছে, কোনোভাবে তা যদি ভেতরে ঢোকে তাহলে সেটাই হবে তার অন্তিম কবর।

আমার জান্নাতের বাড়ি

গল্পটি নিছক কোনো গল্প নয়। গল্পটি এক মহীয়সীর। জগতের জাঁকজমক তাকে ভোলাতে পারেনি। যন্ত্রণাকাতর পরিবেশ তাকে আটকে রাখতে পারেনি। তার বিশ্বাস এত গাঢ় ছিল যে—জীবনকে মনে হয়েছে তুচ্ছ। তিনি ছিলেন রানি; কিন্তু প্রাসাদের উঁচু প্রাচীর কিংবা সিংহাসন তার দৃষ্টিতে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। দুনিয়ার প্রাসাদ চিরে তার দৃষ্টি পৌঁছে গেছে ওপারের প্রাসাদে। ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া মৃত্যুর পূর্বক্ষণে জান্নাতে তার যে আপন আলয় দেখেছিলেন তা রূপক কিছু ছিল না; তা ছিল দিব্যদৃষ্টি।

আসিয়ার আবেগমাখা দুআ উদ্ধৃত করে কুরআনে আল্লাহ বলছেন—

> *বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ ফিরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত মেলে ধরছেন। সে বলেছিল, হে আমার রব, জান্নাতে আপনার কাছে আমার জন্য একটি ঘর বানিয়ে দিন। ফিরাউন আর তার অপকর্ম থেকে আমাকে বাঁচান। অত্যাচারী লোকদের কবল থেকে আমাকে রক্ষা করুন।*[১]

আসিয়ার কাহিনি কতবার শুনেছি। কতবার কতভাবে তার কাহিনি আমার হৃদয়ে দোলা দিয়েছে; কিন্তু এবার সম্পূর্ণ ভিন্ন এক কারণে তার কাহিনিটা আমাকে নাড়িয়ে দিয়েছে।

---

[১] সূরা তাহরিম, আয়াত : ১১

কিছুদিন আগে এক বড়সড় বিপদের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। আশেপাশে ভালো ভালো মানুষ থাকার যে কী সুবিধা—তা আর কী বলব। কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে গেলে হয়তো একটা টেক্সট মেসেজ, একটা ফেইসবুক স্ট্যাটাস কিংবা গ্রুপ ইমেলের প্রতিউত্তরে হাজারে হাজারে দুআর ঝরনা বয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ।

তো আমিও সবাইকে অনুরোধ করলাম, সবচে দামি উপহার চাইলাম সবার কাছে—আমার জন্য আন্তরিক দুআ করতে বললাম। বিনিময়ে যা পেয়েছি তাতে আমি সত্যিই অভিভূত। আমি কখনো আল্লাহর এই উপহার ভুলব না। মানুষ তাহাজ্জুদের সালাতে, কাবাঘরের তাওয়াফে, সফরে—এমনকি প্রসবকালীন সময়ও আমার জন্য দুআ করেছেন। এত এত দুআর মাঝে একটি দুআর কথা আজও আমার চোখে জ্বলজ্বল করে ভাসছে। একটি টেক্সট মেসেজে একজন লিখে পাঠিয়েছিলেন—

> আহা, জান্নাতে যদি নিজের একটা বাড়ি দেখতে পেতেন! তাহলে হয়তো এই কঠিন সময়টা অনেক সহজ হয়ে যেত। দুআ করি, আপনাকে যেন জান্নাতের বাড়ি দেখানো হয়।

মেসেজটা পড়ে কয়েক মুহূর্ত বাকরুদ্ধ হয়ে ছিলাম। কখন যে চোখ ভিজে ঝাপসা হয়ে স্মার্টফোনের পর্দা ভিজিয়ে দিয়েছে টেরই পাইনি।

মহীয়সী নারী আসিয়ার কাহিনিটা নতুন করে আবার ভেসে উঠল চোখের সামনে। নতুন এক চমক নাড়া দিল হৃদয়ে। পৃথিবীতে একজন মানুষ যত নিকৃষ্ট নির্যাতনের মুখোমুখি হতে পারেন আসিয়া ঠিক ততগুলো অত্যাচার ভোগ করার মতো খারাপ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। পৃথিবীর বুকে হাঁটা সবচে অত্যাচারী শাসক ছিল ফিরাউন। সে শুধু আসিয়ার শাসক ছিল না; সে ছিল তার স্বামী। শেষ ক্ষণে সবচে নিষ্ঠুর নির্যাতন চালাচ্ছিল সে; কিন্তু কী অবাক ব্যাপার! আসিয়ার মুখে হাসি। এত কঠিন অত্যাচারের মুখে কীভাবে কারও ঠোঁটে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠতে পারে?

এত অবর্ণনীয় পীড়নেও তার মুখে হাসি ফুটে উঠল, অথচ সামান্য যানজটে আমরা অস্থির হয়ে যাই। কিংবা কেউ আমাদের সঙ্গে অবিচার করলে আমরা তা মোকাবিলা করতে পারি না। অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পরও কীভাবে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের কাছে সে আগুন শীতল হয়ে উঠল? যার কিছু নেই, কেন সে কিছু নিয়ে কোনো অভিযোগ করে না, অথচ যার সব আছে সে সারা দিন শুধু ঘ্যানঘ্যান করে যায়? জীবনের বড় চ্যালেঞ্জগুলোতে সবর করতে পারি, অথচ

প্রতিদিনকার ছোটখাট সমস্যাগুলোতে কেন খেই হারিয়ে ফেলি?

কিছু কিছু জিনিস সহ্য করা আসলেই কঠিন। আমি ভাবতাম, এ জন্যই বিপদাপদ সহ্য করা সহজ নয়। আমি আগে ভাবতাম, বিপদাপদে কষ্টের বুঝি ক্রমধারা অনুযায়ী কোনো তালিকা আছে। যেমন লাইনে দাঁড়িয়ে টিকেট পাওয়ার চেয়ে প্রিয়জনের মৃত্যুর শোক অনেক বেশি কষ্টের। খালি চোখেই বোঝা যায় বিষয়টা; কিন্তু আসলে বিষয়টা এমন নয়।

কোনো বিপর্যয় কঠিন বলে তা সহ্য করা কঠিন হয়ে যায় না। সেটা সহ্য করা কতটা কঠিন আর সহজ হবে, তা নির্ভর করে এক অদৃশ্য মাত্রার ওপর। ঐশী সাহায্য কতটা পেলাম তার ওপর নির্ভর করে এটা। আল্লাহ যতক্ষণ না কোনোকিছু আমার জন্য সহজ করছেন, ততক্ষণ ওটা আমার জন্য সহজ হবে না। হোক সেটা যানজট বা দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ানো। আর আল্লাহ কোনো কিছু সহজ করে দিলে সেটা আমার জন্য মোটেও কঠিন কিছু না। অসুখবিসুখ, মৃত্যু তো নয়ই, অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ বা স্বৈরাচারী অত্যাচারীর চরম অত্যাচারও না।

ইবনে আতাউল্লাহ সাকান্দারি অত্যন্ত চমৎকারভাবে বলেছেন, 'আল্লাহর মাধ্যমে চাইলে সবই সহজ। নিজের মাধ্যমে চাইলে সবই কঠিন।'

ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে আগুনে ফেলা হয়েছিল। আল্লাহ চান তো এমন কঠিন পরিস্থিতিতে হয়তো আমাদের কাউকে পড়তে হবে না; কিন্তু মাঝেমাঝেই আমরা মানসিক, সামাজিক অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হই। আল্লাহ ইচ্ছে করলে আমাদের এসব যন্ত্রণাও মুহূর্তে শীতল হয়ে যেতে পারে।

আসিয়া শারীরিকভাবে নির্যাতন পোহাচ্ছিলেন; কিন্তু আল্লাহ তাকে জান্নাতে তার ঘর দেখিয়ে দিয়েছেন। আর তাই তো তিনি সেই চরম যন্ত্রণাকাতর মুহূর্তটিতেও হাসতে পেরেছেন। আমাদের দিব্যচোখ এই দুনিয়াতে জান্নাত দেখবে না বটে; কিন্তু আল্লাহ চাইলে আমাদের মনের চোখে তা দেখাতে পারেন। আমাদের কষ্টগুলো কি তখন আর কষ্ট থাকবে? হয়তো তেমন কঠিন মুহূর্তে আমাদের মুখেও হাসির রেখা ফুটে উঠবে।

তা হলে এই বিপদটা কোনো সমস্যা নয়। ক্ষুধা বা ঠান্ডা সমস্যা নয়। সমস্যা হচ্ছে সেই ক্ষুধা-ঠান্ডায় আমাদের কাছে প্রতিষেধক আছে কি না। থাকলে ওগুলো

আমাদের কিছু করতে পারবে না, আমাদের কোনো কষ্ট হবে না। সমস্যা হয় তখন, যখন ক্ষুধার সময় খাবার থাকে না। তুষারপাতে আশ্রয় থাকে না।

আমাদের পরিশুদ্ধ করার জন্য, শক্তিশালী করার জন্য, আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার জন্য এসব বিপদাপদ তিনিই পাঠান; কিন্তু মনে রাখবেন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা আর ঠান্ডার সঙ্গে খাবার, পানি আর আশ্রয়ও তিনি পাঠান। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র আল্লাহই পাঠান। তার সাথে তিনি সবর আর সন্তুষ্টিও পাঠাতে পারেন পরীক্ষা সহজ করার জন্য।

আদম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ যে দুনিয়াতে পাঠালেন, সেখানে তো তাকে অবশ্যই অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে; কিন্তু সাথে সাথে আল্লাহ তাঁর ঐশী সাহায্যের কথাও জানিয়ে দিলেন, তিনি বললেন, 'জান্নাত থেকে তোমরা সবাই বের হয়ে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। আমার কাছ থেকে তোমাদের কাছে পথনির্দেশ আসবে। যে আমার পথনির্দেশ মেনে চলবে সে কখনো ভুল পথে যাবে না, ভুগবে না।'[১]

তায়েফে নবিজি যে দুআটি করেছিলেন সেটি আমার অন্যতম প্রিয় একটি দুআ। রক্তাক্ত ও জখমি অবস্থায় নবিজি তার রবের কাছে ফরিয়াদ জানিয়েছিলেন, আপনার যে বিভূতিতে সব অন্ধকার দূর হয়ে যায়, ইহকাল-পরকালের সবকিছু ঠিক হয়ে যায়, সে বিভূতি আপনার কাছে চাই।[২]

আল্লাহ যাদের ভালোবাসেন, তাদের তিনি অবশ্যই পরীক্ষা করেন। তিনি তাদের ঈমান অনুযায়ী যাচাই করেন; কিন্তু সে পরীক্ষা যেন সহজ হয়, আগুন যেন শীতল অনুভূত হয়, সে জন্য ঐশী সাহায্যও পাঠান। তাঁর আলোর একটুখানি দ্যুতি কিংবা তাঁর পাশেই একটি বাড়ির আশ্বাস শত পরীক্ষার মাঝেও হাসি ফোটাতে পারে আমাদের মুখে।

[১] সূরা ত-হা, আয়াত : ১২৩

[২] *তাফসির ইবনু কাসির*, সূরা আহকাফের ২৯ নং আয়াত দ্রষ্টব্য